OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 154 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 154 - 158
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের নারীর অবস্থান, আধুনিকতার বিপরীত প্রতিচ্ছবি : রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'

তানিয়া সুলতানা
এম. এ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: taniasultana2110@gmail.com
0009-0003-1435-3122

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Modernity, Nineteenth Century, Rationalism, Literary Thought, Individuality, Voice of Women, Amar Jiban, Counter-image.

Abstract

The nineteenth century was the era of modernity—a modernity that taught us to bypass old beliefs and superstitions, viewing the world and life through a fresh lens, and scrutinizing ancient dogmas and scriptures with a rational mind. During this time, humanity became the focal point of various social and religious reform movements. Furthermore, women emerged at the forefront of the discourse during this transformative period. In the reformist efforts of Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar, as well as in the literary thoughts of contemporary writers, the voices and social status of women were repeatedly highlighted. Consequently, the emergence of a woman's sense of individuality is considered one of the defining characteristics of nineteenth-century modernity.

In other words, the position women held in ancient and medieval society underwent a significant shift during this era. But did the lives of women truly change in reality? For women living in the shadows of obscurity, it was not so simple for everything to change suddenly just because the times demanded it. This reality is documented in one of the most discussed texts of the nineteenth century, Rashsundari Devi's Amar Jiban (My Life). One could argue that this book captures the actual condition of women in the nineteenth century; it stands as a counter-image to the idealistic portrait of modernity.

Discussion

উনিশ শতকে সূচনালগ্নে বাংলা সমাজ এক গভীর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে একদিকে নবজাগরণের প্রভাবে চিন্তার মুক্তি, শিক্ষার প্রসার এবং সাহিত্যিক বিকাশ সমাজ জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও সমাজের একটি বড় অংশ ছিল আলোচনার বাইরে। সেই বড় অংশের মধ্যে আছে ইতর সাধারণ আর আছে মেয়েরা। বিশেষত নারী সমাজকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত ও অবদমিত করে রাখে পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবী। উনিশ শতকের নারীজীবন ছিল মূলত অন্তঃপুরবাসিনী। অল্প বয়সে বিয়ে পর্দাপ্রথা এবং সামাজিক বিধিনিষেধ তাদের স্বাধীন সত্তার বিকাশকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 154 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রুদ্ধ করে রেখেছিল। শিক্ষার অধিকার তো দূরের কথা অনেকক্ষেত্রে লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটা ও ছিল ঘোর অপরাধের, তা একপ্রকার নিন্দনীয় ও ভয়ের বিষয়। নারীরা জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত হয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ হারান তাদের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে সংসারের সংকীর্ণ পরিসরে।

বোয়ালিয়াস্থ কোনো ভদ্রমহিলা বঙ্গদেশীয় মহিলাগনের স্বাধীনতা বিষয়ে লেখেন—

> "স্ত্রীলোকদিকের উপর পুরুষদিকের অতীব প্রভুত্ব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। কিন্তু স্ত্রী লোকেরা তাহাতে কিছু আপত্তি করিতে পারিবেন না। কি আশ্চর্য! মহিলারা বিদ্যাভূষণে ভূষিতা হইয়া স্বাধীনতা সহকারে সংসারধর্ম নির্বাহ করিতে যত্নশীলা হইবে, দেশবিদেশীয় সকল লোকের নিকট আদরের পাত্রী হইবে, ইহা অপেক্ষা পুরুষদিকের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে?"[১]

অর্থাৎ নারীরা সংসারের গন্ডিতেই আবদ্ধ থাকবে। স্নেহের নজরে বা আদরের পাত্রী হয়েই থাকবে, অন্তঃপুরের যাঁতাকলেই বন্দি থাকবে। বাইরের পৃথিবী তাদের জন্য বঞ্চিত, তারা পরাধীন। লক্ষ্মীমণি দেবীর লেখায় আছে—

> "পরাধীন হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শত শত গুণে শ্রেয়স্কর বলিতে হইবে।"[২]

মায়াসুন্দরী দেবী লিখেছেন—

> "আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ... আমাদিগের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিমর্ষ। ... আমরা লেখাপড়া শিখিতে পাইনা, আমাদের মনে বিদ্যার অঙ্কুর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজের কুনিয়মবশত তাহা অঙ্কুরাবস্থায় থাকিয়া যায়।"[৩]

অর্থাৎ, নারীজন্ম ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্ভর।

উনিশ শতকের এই ঘোর অন্ধকারচ্ছন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম হিসেবে আবির্ভূত হন রাসসুন্দরী দাসী। তিনি ছিলেন এক সাধারন গৃহবধূ কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত জ্ঞান পিপাসা ও অদম্য মানসিক শক্তি তাঁকে অসাধারণ করে তোলে। অদম্য সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে ও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিকে রূপ দেন গ্রন্থ আকারে। তাঁর রচিত 'আমার জীবন' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি নিছকই একটি আত্মজীবনী নয়, বরং উনিশ শতকের নারী মনের অর্ন্তলোক উন্মোচনের ও আত্মজাগরণের বিরল দলিল।

তিনি ছিলেন এক আটপৌরে গ্রাম্যনারী। পূর্ববাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে বিশাল সংসারে তিনি সারাজীবন ঘানি টেনেছেন। কোনো বিদ্যালয়ে তিনি যাননি, কেউ তাঁকে বাড়িতেও বিদ্যাশিক্ষা দেয়নি। বহুকষ্টে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে পড়া শিখেছেন। তারপর ষাট বছর বয়সে অত্যন্ত ঝরঝরে সহজ সাবলীল সতেজ গদ্যে লিখে ফেলেছেন তাঁর আত্মজীবনী। একারণেই তিনি জড়িয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে। এটাই হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মজীবনী। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে। পরবর্তীতে ১৮৯৭ সালে দ্বিতীয় অংশ সংযোজন করে প্রকাশিত হয় দুটি ভাগে। বইটির প্রতিটা অধ্যায় শুরু হয়েছে নিজের লেখা ভক্তিগান বা কবিতার মাধ্যমে।

গ্রন্থটির প্রথম অংশের শুরুতেই তিনি দেবী সরস্বতীর চরণ বন্দনার মাধ্যমে শুরু করেন। ১২১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে রাসসুন্দরী দাসীর জন্ম। মার কাছে পালিতা রাসসুন্দরী ছিলেন খুবই ভীরু এবং শান্তশিষ্ট স্বভাবের। মা তাঁকে শেখান কিভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। এই ভগবতবিশ্বাস থেকেই তাঁর মনে এমন ভাবে রোপিত হয় যে শেষ বয়স পর্যন্ত তার আশ্রয় ছিল এই বিশ্বাস এবং তিনি বিশ্বাসের বলেই সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখার ধরণ ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তাঁর গদ্যভাষা নিপুন ও নিরেট। শিশু বয়সের নিজের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দাসী বলেছেন—

"বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তার ছিল গঠন ও সকল।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 154 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সেইপরিমানে ছিল হস্তপদ গুলি
বলিত সকলে মোরে সোনার পুতুলী।”[৪]

শিশু বয়স থেকেই তিনি ছিলেন পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী। সকাল সন্ধ্যা তিনি তার বাড়িতে যে মেম সাহেবের কাছে গ্রামের সব ছেলেরা পড়া শিখতো সেই পাঠশালাতেই তিনি থাকতেন। তৎকালীন সময়ে ছেলেরা মাটিতে দাগ কেটে পড়া শিখত। রাসসুন্দরী মনে মনে সেই পড়া শিখে ফেললেন পারসি ভাষা ও তিনি সেভাবেই শিখলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাড়িতে আগুন লেগে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই রাসসুন্দরীকেও পড়াশোনা সেখানেই ক্ষান্ত দিতে হয়।

প্রথম ভাগের দ্বিতীয় রচনায় আমরা দেখি রাসসুন্দরী মাত্র চার বছর বয়সেই পিতৃহারা হয়েছিলেন এবং তিনি তার পিতা সম্পর্কে ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ। সেই মেম সাহেবের স্কুলে কোন এক ভদ্রলোক রাসসুন্দরীর মেম সাহেবের কাছে বসে থাকা নিয়ে চরম রসিকতার সহিত রাসসুন্দরীর খুঁড়োকে খোঁচা মেরে বলেন - রায়মশাই বুঝি মঙ্গল ঘট বসাইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে নারীরা এভাবে খোলামেলা ভাবে পাঠশালায় বসে থাকা তাদের কাছে ছিল অত্যান্ত ঘৃণ্য কাজ।

তার পরবর্তীতেই সেই ভদ্রলোক রাসসুন্দরীর খুড়োর কাছে জানতে চাই - ‘এটি কাহার কন্যা’ এবং রাসসুন্দরীর খুড়ো জানাই যে এটি পদ্মলোচন রায়ের কন্যা। প্রাক্-কিশোরী রাসসুন্দরী অবাক হন কারণ এতদিন তিনি জানতেন তিনি তাঁর মায়ের কন্যা। রাসসুন্দরী তার জীবনীতে উল্লেখ করছেন—

> “এ কন্যাটি পদ্মলোচন রায়ের। ঐ কথা শুনিয়া আমি অত্যান্ত ভাবিত হইলাম, আমার মন এককালে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এতদিবস আমি জানিতাম, আমি মায়ের কন্যা। বিশেষ আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমি এই কথা যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মন বিষন্ন হইতে লাগিল।”[৫]

এরপর শিশু রাসসুন্দরী পিসির কাছে জানতে পারেন তিনি পদ্মলোচন রায়ের কন্যা অর্থাৎ আপাত সরল শিশু রাসসুন্দরীর মনের গভীরে কোথাও একটা চরম আঘাত লাগে এবং তিনি সেই শিশুকাল থেকে দেখেন যে, চিরকাল নারীর পরিচয় পুরুষদের ওপর নির্ধারিত থাকে। বিয়ের আগে পিতৃপরিচয় এবং পরে স্বামী ও আরো পরে সন্তানের মা হিসাবে তারা কেন পরিচিত হবে কেন নিজস্ব পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠবে না? এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। শুধুমাত্র উনিশ শতকেই নয় বর্তমানে একুশের গণ্ডিতে ও আমরা দেখি একটি শিশুর পরিচয় তার পিতৃপরিচয়ের ওপরেই নির্ধারিত হয়। সমাজ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটলেও এদিকে আমরা এখনো উন্নত হতে পারিনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এখনো অবহেলিত অবদমিত। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার নগ্ন প্রকাশ রাসসুন্দরীর জবানিতেই প্রথম উঠে আসে।

প্রথম ভাগের তৃতীয় রচনায় আমরা দেখি মাত্র বারোবছর বয়সে রাসসুন্দরীর বিবাহ হয়। তাঁর জীবন হয়ে ওঠে গৃহবন্দী ও পরাধীন। স্বাধীনভাবে বাইরে যাওয়ার বা নিজের ইচ্ছা প্রকাশের তার কোন সুযোগ ছিল না। তিনি ঘরের কাজেই আবদ্ধ হয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও অবমূল্যায়ন তিনি সারাদিন সংসারের কাজে পরিশ্রম করলেও তার কোন স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন ছিল না। আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন— চাকর-চাকরানীসহ প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জনের রান্নাই করতে হতো। কোনো কোনো দিন দশসের চাল রান্নার বর্ণনা ও পাওয়া যায়। এছাড়া বিগ্রহপূজা পথিক এবং অতিথি সেবার মতো কাজেরও কমতি ছিল না। সংসারের কাজের চাপে মেয়েদের করুন অবস্থার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী বলেছেন—

> “তখন মেয়ে ছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া-দাওয়ার কর্ম্ম সারিয়া কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দন্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই।”[৬]

অর্থাৎ নারী যেন একটি কর্মযন্ত্র, যার নিজস্ব সত্তা বা ব্যক্তিত্বের কোন মূল্যই ছিল না। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 154 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, 'যে বউ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কইবে না, তাহা হইলেই বড় ভালো বউ হইল। সেকালে এখনকার মতন চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত্ ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম'।"[৭]

তিনি আরও লেখেন—

> "যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্ম্মের রীতি ছিল। আমি ওই রীতিমতেই চলিতাম।"[৮]

গৃহবন্দী ও পরাধীন জীবন তাদের নিজেদের মত প্রকাশের কোন সুযোগ দিত না। তিনি ছিলেন সংসারের কাজেই আবদ্ধ, নিজের ব্যাক্তিগত ইচ্ছার মূল্য ছিল না বললেই হয়। কঠোর পরিশ্রম ও অবমূল্যায়ন সারাদিন সংসারের কাজে পরিশ্রম করলেও কোন স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন নারীদের ছিল না। নারীর শ্রমকে স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত যা একধরনের অবমাননা। রাসসুন্দরীর জীবন ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর এই ভয়ানক শ্রমকে কখনো কেউ গুরুত্ব দেয়নি বরং এটা ছিল 'স্বাভাবিক কর্তব্য'। বিয়ের পর রাসসুন্দরী জীবন হয়ে উঠেছিল পিঞ্জরবদ্ধ পাখি। তিনি একজায়গায় বলেছেন—

> "লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরের বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই...।"[৯]

রাসসুন্দরী চতুর্থ রচনায় দুটি বাক্যে বলেছেন—

> "এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।
> পিঞ্জরেতে পাখি বন্দী, জালে বন্দি মীন।।"[১০]

কতটা সহজ ভাষায় মনোমুগ্ধকর ভাবে সেই সময়ের নারীদের ব্যাথিত হৃদয়ের গোপন কথা তুলে ধরেছেন। এভাবেই রাসসুন্দরীর যখন সংসারে বদ্ধ পাখির মতো বন্দি অবস্থা তখন এক সময় খবর পান তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সংসারের যাঁতাকলে তিনি এমনভাবে বাঁধা পড়েছিলেন যে মায়ের মৃত্যুর সময় মায়ের কাছেও যেতে পারেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন—

> "আমি এমন অধমা পাপীয়সী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়েছি। ...আমার নারীকূলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবন ধিক্। ...আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালে সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানেই থাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর - বদ্ধ বিহঙ্গী।"[১১]

এই আক্ষেপ বাণী রাসসুন্দরীর কণ্ঠে উন্মোচিত হয়েছে। এই গভীর আর্তনাদ, এই মানসিক যন্ত্রণা, এই স্বাধীনতার অভাব বন্দীত্ব জীবনের নিষ্ঠুর বাণী যেন রাসসুন্দরীর জীবনের মাধ্যমে তৎকালীন উনিশ শতকের সমস্ত নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠে এসেছে তাঁর জবানীতে।

পুঁথি পড়ার আগ্রহ থেকেই লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিলেন রাসসুন্দরী দেবী। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না। মেয়েদের হাতে কাগজ দেখলে বৃদ্ধরা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। পাঠশালায় ছেলেদের পড়া দেখে যা শিখেছিলেন সেগুলো কিছুটা মনে ছিল এবং স্বপ্নে দেখলেন চৈতন্যভাগবত পাঠ করছেন। শরীর মন তখন তার পুলকিত হয়ে ওঠে। ঠিক করলেন তিনি চৈতন্যভাগবত পড়বেন এবং তার একটা পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখলেন রান্নাঘরে। রাসসুন্দরী লিখেছেন তৎকালীন সময়ে বইয়ের অক্ষর ছিল তালপাতার লেখা অক্ষর। তিনি সেই অক্ষর আর লোকের কথার সঙ্গে মিলিয়ে বহু কষ্টে শেষ করলেন চৈতন্যভাগবত। স্বামী সীতানাথ সরকার সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছ্বলঘরের সংবেদনশীল মানুষ হলেও মেয়েদের লেখাপড়ায় তিনি কোনদিন উৎসাহ দেখাননি। তাই বঞ্চিত ও সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট মেয়েদের বদ্ধজীবন সর্বদা তাঁকে পীড়া দিয়েছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 154 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংসারের দায়িত্বভার কেন সর্বদা মেয়েদেরকেই সহ্য করতে হবে এই ছিল তাঁর নীরব প্রতিবাদ। বই পড়া চলছিল ভালোই। আগ্রহ আরোও বাড়তে লাগল। একে একে শেষ করলেন চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, জৈমিনীভারত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মিকীপুরাণ। পরবর্তীতে সপ্তমপুত্র কিশোরীলালের উৎসাহে লিখতেও শিখেছিলেন।

রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' গ্রন্থটিতে তাঁর মনের গভীর বেদনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি উনিশ শতকের নারী জীবনের প্রকৃত অবস্থানের জীবন্ত দলিল। তিনি নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে চাইলেও সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ তাঁকে বারবার থামিয়ে দিয়েছে। সবশেষে বলা যায়, 'আমার জীবন' গ্রন্থটিতে নারী অবমাননার যে চিত্র পাওয়া যায় তা কেবল একজন নারীর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা নয়, এটি উনিশ শতকের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও রাসসুন্দরীর আত্মপ্রকাশ, অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও নিজের জীবনকে লিপিবদ্ধ করার সাহস এক আলোকবর্তিকার মতো। তাঁর এই প্রয়াস নিঃশব্দে জানান দেয়, অবমাননার মধ্যেও প্রতিবাদের শক্তি জন্ম নিতে পারে, আর সেই শক্তিই একদিন পরিবর্তনের পথ তৈরি করে।

Reference:

১. বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সংকলন ও সম্পাদনা সুতপা ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৪, SBN : 978-81-260-2510-7, পৃ. ৫
২. তদেব, পৃ. ৬
৩. তদেব, পৃ. ৭-৮
৪. রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংসস্করণ ২০১৫, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ৩৮
৮. তদেব, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৩
১১. তদেব, পৃ. ৪৫